International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2019; 1(1): 69-73
Received: 01-06-2019
Accepted: 05-07-2019

অমর কুমার মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান রাজ কলেজ, বর্ধমান
বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

Corresponding Author:
অমর কুমার মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান রাজ কলেজ, বর্ধমান
বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ - দুই কথাসাহিত্যিকঃ জীবনানন্দ দাশ ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমর কুমার মণ্ডল

জীবনানন্দ দাশ ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের দুই স্তম্ভ। কথাসাহিত্য রচনা মধ্যে দিয়ে দুজনেই বাংলা ভাষাকে বিষয়বস্তুর নতুনত্বে সমৃদ্ধ করেছেন। একজন কথাসাহিত্যিক হিসেবে অনেকটা অজানা-অচেনা আর একজন জনপ্রিয়। জীবনানন্দ জন্মেছেন ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ ১৮ ফেব্রুয়ারি আর বিভূতিভূষণ জন্মেছেন ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১২ সেপ্টেম্বর। দুজনের মধ্যে মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধান। আশ্চর্য এই যে মৃত্যুও তাদের ওইরকম চার পাঁচ বছরের ব্যবধানে। বিভূতিভূষণ মারা গেছেন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর ঘাটশিলায়, আর জীবনানন্দ মারা গেছেন ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ২২ অক্টোবর কলকাতায় ট্রাম এক্সিডেন্টে।

বিভূতিভূষণের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার পানিতর গ্রামে। পৈতৃক বাসস্থান ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ মহাকুমার ব্যারাকপুর গ্রাম। বিভূতিভূষণের পিতা হলেন মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মা মৃণালিনী দেবী। মহানন্দ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কথক এবং কবিতা ও নাটক রচয়িতা রূপে সুপরিচিত। পৈতৃক সূত্রে বিভূতিভূষণ কথকতা, সাহিত্যরচনা এবং দেশ ভ্রমণের নেশা অর্জন করেছিলেন। বাবার কাছেই প্রথম শিক্ষার সূচনা। পরবর্তীকালে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই.এ. পাস করেন। এরপর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ডিস্ট্রিংশন নিয়ে বি.এ. পাস করেন। এই সময় বসিরহাটের মোক্তার কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা গৌরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. ও 'ল' ক্লাসে ভর্তি হন। তবে এই সময় তাঁর প্রথমা স্ত্রী গৌরী দেবীর মৃত্যুতে শেষ পর্যন্ত কর্মসূত্রে জড়িয়ে পড়ায় আর পড়াশোনা সমাপ্ত করতে পারেন নি। তিনি প্রথমে হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় কেশোরাম পোদ্দার-এর গোরক্ষিণী সভার ভ্রাম্যমান প্রচারকের চাকরি নেন। কিছুদিন কর্মে যুক্ত থাকার পরে পাথরিয়াঘাটার খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। চাকরি সূত্রে তিনি বাংলাদেশ, ভাগলপুর বিভিন্ন স্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করেন।

জীবনানন্দ জন্ম গ্রহন করেন বরিশালে। পিতা সত্যানন্দ দাস। ব্রজমোহন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। মাতা কুসুমকুমারী দাস। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই.এ.পাস করেন।বি.এ. পড়ার সময় কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি অনার্স সহ বি.এ. পাস করেন। তিনি ইংরেজিতে এম.এ. ও 'ল' নিয়ে ভর্তি হন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. পাস করেন। আইন নিয়ে পড়তে পড়তে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সিটি কলেজে জীবনানন্দের চাকরি হয়। তিনি আর আইন পড়া শেষ
করেন নি।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বিভূতিভূষণ হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতায় প্রবেশ করেন। এ সময় পাঁচু গোপাল বা যতীন্দ্রমোহন রায় নামে এক শিশুকবির জন্য বাধ্য হয়ে বিভূতিভূষণ 'উপেক্ষিতা' নামে একটি ছোটগল্প লেখেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ) মাঘ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়। এই গল্প পড়ে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁকে ২৫-১-১৯২২ খ্রিস্টাব্দে একটি চিঠিতে অভিনন্দন জানান। মনে হয় সেই অভিনন্দনের জন্যই এবার তিনি আরেকটি গল্প লেখেন নাম 'উমারানি'। কারো কারো মতে এইরকম গল্প লেখার জন্যই তাঁকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকরি ছাড়তে হয়েছিল। তাহলে কি সেই গল্পে কোনো অশ্লীল কিছু ছিল? নাকি ছিল কোনো আধুনিকতার ইঙ্গিত? যা সেই সময়ের নীতিবাগীশগণ মেনে নিতে পারেন নি।আজ জানতে ইচ্ছে করে।

বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে বিভূতিভূষণের প্রথম রচনা ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ছোটগল্প 'উপেক্ষিতা' যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আর জীবনানন্দের প্রথম রচনা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে লেখা কবিতা 'বর্ষ আবাহন' 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে বিভূতিভূষণ লিখতে শুরু করেন 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস। 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদক বন্ধু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি তা পড়ে শোনান। 'বিচিত্রা'য় ১৩২৫ বঙ্গাব্দ আষাঢ় থেকে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নেন নীরদ. সি. চৌধুরী ও 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস।

পরবর্তী উপন্যাস 'অপরাজিত' ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মাসিক 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখালেখির মাধ্যমে কিছু সুনাম হলেও সাংসারিক দুঃখ কষ্ট ছিল। তিনি তাঁর লেখার দিনলিপি 'তৃণাঙ্কুর'এ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বলেছেন - ''অনেক বেড়েছি - সেটা বেশ বুঝতে পারি - এই দুঃখ, খাটুনি, কম মাইনে, ছেলে পড়ানোর মধ্য দিয়েও বেড়ে উঠছি। মানুষ কখন কিভাবে কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে - তা কেউ জানে না।'' যাঁরা বলেন বাংলা কথাসাহিত্যে প্রকৃতির বাস্তব চিত্র প্রকাশ করেছিলেন বিভূতিভূষণ আর কাব্যসাহিত্যে জীবনানন্দ, তাদের সমস্ত অভিমত মেনে নিয়েই বলছি — বক্তব্যটি সামান্য পরিবর্তন করলেও তেমন অসুবিধা হয় না। সেই বক্তব্যটি হল - শুধু কাব্য-কবিতায় নয়, কথাসাহিত্যেও প্রকৃতির রূপ এবং দরিদ্র, অসহায় মানুষের কথাও জীবনানন্দ লিখেছিলেন। যে সময়ে বিভূতিভূষণ তাঁর 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস লিখেছেন ঠিক সেই সময় জীবনানন্দ লিখেছেন গল্প-উপন্যাস। কিন্তু তা তিনি প্রকাশ করেননি। জীবনানন্দ কাফকার মতোই শুধু লিখে গেছেন প্রকাশের কথা ভাবেননি। প্রায় একই সময়পরিধিতে বিভূতিভূষণ ও জীবনানন্দের সাহিত্যিক জীবন শুরু এবং শেষ। বিভূতিভূষণ বছর পাঁচেকের বড় হলেও দেখা যাচ্ছে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে তাঁরা বি.এ. পাস করেছেন। তবে জীবনানন্দের এম.এ. পাশের খবর থাকলেও বিভূতিভূষণের কোনো পাস করার তথ্য জানা যায় না কারণ হিসেবে তার প্রথমা স্ত্রী গৌরী দেবীর মৃত্যু শোককেই ধরা হয়।

বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী' লিখতে শুরু করেন ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় জীবনানন্দ লিখেছেন ছোটগল্প 'গোলাপী' এবং 'কমলা'। তবে রচনার সংখ্যার কথা উঠলে অবশ্যই জীবনানন্দ বিভূতিভূষণকে ছাপিয়ে যান। কিন্তু কোনো এক দ্বিধায় জীবনানন্দ তাঁর লেখা প্রকাশ করেননি। আসলে একজন লেখকের লেখা শেষ করে যাওয়া এক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তা কখনো জয়েসের মতো, কাফকার মতো, বা কামুর মতো- জীবনানন্দ ঠিক সেই রকম লিখে গেছেন। প্রকাশিত হল কি না সেই দিকে তাঁর খেয়াল থাকে না, মাথায় থাকে কিভাবে তিনি লিখে শেষ করতে পারবেন- সেই চিন্তা। মনের মধ্যে সাজানো কথাগুলোকে লিখে রেখে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে লেখেন ছোটগল্প 'করবী'। তবে আমার ম'নে হয় তিনি আরো অনেক গল্প লিখেছিলেন, কারণ এত কম লেখার মানুষ তিনি ছিলেন না। কবিতা রচনার পাশাপাশি তিনি বাংলা গদ্যকে নতুন আঙ্গিক গঠনের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে জীবনানন্দ প্রকাশ করেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক'। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বিভূতিভূষণ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন 'পথের পাঁচালী'। এরপর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বিভূতিভূষণ প্রকাশ করেন গল্পগ্রন্থ 'মেঘমল্লার' কিন্তু জীবনানন্দ কিছুই প্রকাশ করলেন না। অথচ লিখলেন ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ১৩টি গল্প, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ১৪টি গল্প যা প্রকাশ করলে দুটি গল্পগ্রন্থ হতেই পারতো।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বিভূতিভূষণ প্রকাশ করেন 'অপরাজিত' প্রথম খন্ড এবং দ্বিতীয় খন্ড। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বিভূতিভূষণ প্রকাশ করেন আর একটি গল্পগ্রন্থ 'মৌরিফুল'।

আসুন এবার দেখা যাক জীবনানন্দ তখন কী করছেন বা কী লিখছেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠিত বেকার। কারণ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র ক'রে সিটি কলেজে যে গন্ডগোল ঘটেছিল তার কোপ পড়েছিল জীবনানন্দের ওপর, তিনি চাকরি হারিয়েছিলেন। সিটি কলেজে ব্রাহ্ম এবং হিন্দু ছাত্র পড়াশোনা করতো। ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা সিটি কলেজ পরিচালিত হত। হিন্দু ছাত্ররা সরস্বতী পুজো করতে চাইলে ব্রাহ্মছাত্ররা বিরোধিতা করে যে কারণে সাময়িক উত্তেজনায় হিন্দু ছাত্ররা সিটি কলেজ থেকে অন্য কলেজে চলে যায়। কলেজের অর্থে ঘাটতি পড়ায় জীবনানন্দেরই চাকরি চলে যায়। যদিও তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনবেন কিন্তু সেই সৌভাগ্য তাঁর জীবনে আর কোনোদিন হয়নি। ইতিমধ্যে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ৯ই মে জীবনানন্দ বিবাহ করেছিলেন লাবণ্য গুপ্তকে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি জন্ম হয় তাঁর একমাত্র কন্যা মঞ্জুশ্রীর। এ বছরেই তিনি লিখেছিলেন 'পূর্ণিমা' নামে একটি উপন্যাস। কিন্তু সংসারে সুখ শান্তি নেই ব'লেই চলে এলেন কলকাতায় চাকরির সন্ধানে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ কলকাতা আর বরিশাল আসা-যাওয়া করেই তাঁর প্রায় সময় কেটে যায়। অথচ এক দানবীয় শক্তিতে তিনি এই বছরেই লিখলেন ৩৭টি ছোটগল্প, উপন্যাস লেখেন ৭টি, পাশাপাশি কবিতা লেখেন যা পরবর্তীকালে 'ধূসর পান্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হবে। আরো আশ্চর্য এই যে ৭টি উপন্যাস লিখেছেন মাত্র চার মাসে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের এর জুলাইতে ৩টি, আগস্ট ২টি, সেপ্টেম্বরে একটি ও অক্টোবরে একটি। এগুলি হলো —'আমরা বেশ আছি', 'চৌত্রিশ বছর ধরে', 'কলকাতা ছাড়ছি', 'আমরা চারজন','কল্যাণী', 'অজিত-পূর্নিমা' জীবনানন্দের দেওয়া নাম, তবে একটু অসম্পূর্ণতার জন্য সম্পাদক যার নাম দিয়েছেন 'জীবনযাপন' এবং 'নিরুপম যাত্রা'। তিনি যে গল্পগুলো লিখেছিলেন সেগুলির কয়েকটি উল্লেখ করা যায় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে লেখা যেমন-'পাতা-তরঙ্গের বাজনা', 'আর্ট এর অত্যাচার', 'মহিষের শিং', 'বিস্ময়', 'শাড়ি', 'হাতের তাস', 'কোন গন্ধ', 'বেশি বয়সের ভালোবাসা' 'বত্রিশ বছর পর' ইত্যাদি জীবনানন্দের ভাষায় 'সাগা' অর্থাৎ ডায়েরি প্রাধান্য দিয়ে প্রায় দিনলিপির উপন্যাস এগুলি। অর্থাৎ উপন্যাসের নায়কের লেখা কবিতার নাম 'ক্যাম্পে' হয়ে যায়। এমনকি জীবনানন্দ নামও তিনি উপন্যাসে লিখে ফেলেন। আসলে আত্মখনন, চেতনাপ্রবাহ, অস্তিত্ব নিয়ে খেলা পঞ্চাশের দশকে ইউরোপে শুরু হয়েছিল ফ্রান্সে। 'ল মোঁদ' পত্রিকায় এমিলি অঁরিও ২২ মে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে 'নুভ্যো রোমাঁ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এর অর্থ হল - নতুন কাহিনী বা নতুন উপন্যাস। সাহিত্যিক আল্যাঁ রোব গ্রিইয়ে, মিসেল বুতো, নাথালি সরোত, মার্গেরিত দ্যুরাস, ক্লদ সিমোঁ, ফিলিপ সোল প্রমুখের হাত ধরে যার যাত্রা শুরু হয়েছে। সমসাময়িক কালে প্রচলিত উপন্যাসের কথক নিজেকে সর্বজ্ঞ ভেবে কাল, স্থানকে এক অভিন্ন একক মনে করে। কিন্তু 'নতুন উপন্যাস' এইভাবে তা দেখতে চাইলো না। তারা একটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে। একটা ঘটনার অসম্ভাব্যতা ও অনিশ্চয়তাকে বেশি করে টানে। মেটাফর অর্থাৎ রূপক বেশি ব্যবহার করে। পাঠক এক্ষেত্রে একটা পাঠের সম্ভাবনায় ভাগ বসাতে পারে। আমরা তাই দেখি মার্গেরিত দ্যুরাসের উপন্যাসে একই চরিত্র ঘুরে ঘুরে একই কথা বলার জন্য বিভিন্ন উপন্যাসে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিতে চায়। আমরা প্রায়শই ইউরোপের সাহিত্যের দিকে বা আধুনিকতার দিকে তাকিয়ে থাকি। সেক্ষেত্রে একটু লক্ষ করলে দেখতে পাই 'নুভ্যো রোমাঁ' প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ মে। কিন্তু ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জীবনানন্দ লিখেছেন সেই অনুভূতির কথা। তখন তিনি কিভাবে কোন্ অনুভূতি নিয়ে তাঁর গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। এ তো শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্য একেবারেই নতুন। কেননা তাঁর এই ৭টি উপন্যাসের তিনটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু একই রকম শুধু চরিত্রের নাম পাল্টে যাচ্ছে ওই 'নতুন নোবেল' বা 'নুভ্যো রোমাঁ'র স্টাইলে। এটা কি করে সম্ভব হলো পাঠককে অবশ্যই ভাবায়। প্রভাকর সেনকে জীবনানন্দ ২.৭.৪৬ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল থেকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন —''আমি খুব সম্ভবত জাত সাহিত্যিপ্রেমিক। যে আবহাওয়ায় ছিলাম তাতে উত্তরকালে ভাল সাহিত্যরসিক হয়েই মুক্তি লাভ করা যায় না, নিজের তরফ থেকে কিছু সৃষ্টি করবারও সাধ হয়। ছেলেবেলা থেকেই গল্প-উপন্যাস - স্বদেশী ও বিদেশী - নেহাৎ কম পড়ি নি। ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচে নি।'' লেখালেখির জন্য তিনি দেশি ও বিদেশি সাহিত্য, দর্শনের সঙ্গে কতখানি যুক্ত ছিলেন তা কেবল ব্যক্তিনাম ব্যবহার করলেই সেই পরিসরের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র অনুভব করতে পারা যায়। হোমার থেকে ম্যাকনিস, দ্বৈপায়ন ব্যাস থেকে সমর সেন, বের্গসঁ, মার্কস, কিয়ের্কে গার্দ, রাদারফোর্ড, প্ল্যাঙ্ক, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, মহাত্মা গান্ধী। এই নাম কেবল বলার নাম হয়ে থাকে না, তাঁর রচনায় প্রসঙ্গের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক প্রমাণ করে যে তিনি দীর্ঘশ্রম ও অনুভাবনার পথ অতিক্রম করেছিলেন। তাহলে এ কথা তো ভাবা যেতেই পারে যে তিনি সমকালীন বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড পড়েছিলেন। পড়ে তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল যে, উপন্যাসের গঠন রীতিতে যে আধুনিকতা আসা প্রয়োজন তা ওই রচনায় নেই। অথচ তাঁর নিজস্ব লেখায় যার প্রতিফলন

রয়েছে, তাকে প্রকাশ করতে পারছেন না পাঠকের কথা ভেবে। কারণ যে লেখা তিনি লিখেছেন তার প্রকরণ, কনটেন্ট একদম নতুন। আমরা জানি পাঠক যা পাঠ করবেন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২২মে এর পর। তাই তাঁর মনে হয়েছে নতুন রীতির এই রচনা প্রকাশ করা অন্তত সেই সময়ে ঠিক হবে না। জীবনানন্দ গ্রিক সাহিত্য পড়েছেন। তিনি জানতেন কিয়ের্কে গার্দ ও তাঁর শিষ্যদের। শিষ্যদের থেকে গুরু ছিলেন অনেক এগিয়ে। কিয়ের্কে গার্দ প্রকাশ করেছেন মানুষের জীবনের অন্তর্নিঃসহায়তার কথা। তাই বলা যায়- যে 'নুভ্যো রোমাঁ'র জন্ম জীবনানন্দের মৃত্যুর পর, অথচ সেই সদস্যদের মতো ক'রে উপন্যাস তিনি লিখতে পারেন। যেখানে কোনো প্লট থাকবে না। 'নতুন নোভেল'- এ মানুষের গতিবিধির চেয়ে ভাবনা-চিন্তার উপর জোর দেয়া হবে বেশি, কাজের চেয়ে কথার উপর। ভাবলে অবাক হ'তে হয় যে তিনি কাফকা (১৮৮৩-৩ জুলাই- ১৯২৪-৩ জুন) না পড়েও কাফকার মতো উপন্যাস লেখার কথা ভাবতে পারেন। তিনি জোর দিয়ে বলতে পারেন যে 'ফিনে গানস্ ওয়েক' লেখার পর যদি জেমস জয়েস বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি আরেকটি উপন্যাস লিখতেন যা দান্তের 'প্যারাডাইসো' দ্বারা প্রাণিত হত।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের দিকে যদি তাকানো যায় তাহলে দেখব- অপুর জন্ম, তার বড় হওয়া, সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট নিয়ে একটু একটু ক'রে এগিয়ে যাওয়া এবং ছোটবেলার নিশ্চিন্দিপুরে দিদি দুর্গার মৃত্যুর শোক বুকে নিয়ে বাবার সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া। 'অপরাজিত'তে দেখা যায় কাশীতে হরিহর-স্ত্রী সর্বজয়া এবং পুত্র অপুকে নিয়ে বাস করছে। সেখানে হরিহরের জজমানি করা, একটি ছোট বাড়ি কেনার ইচ্ছে প্রকাশ এবং ঠান্ডা লেগে হরিহরের মৃত্যু , সেই স্মৃতি মাথায় নিয়ে আবার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসা। মা সর্বজয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমে অপুকে বড় করে তোলা। অপুর পড়াশোনায় ভালো ফল ক'রে বৃত্তি নিয়ে কলকাতায় পড়তে আসা, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে প্রেসে কাজ করা, বন্ধুপ্রীতি তৈরি করা, অবশেষে মায়ের মৃত্যু হলে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামকে ভুলে একেবারেই কলকাতায় চলে আসা-এইসবের মধ্যে রয়েছে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার এক সংগ্রাম। যে সংগ্রামের মধ্যে অপু নিজেকে দাঁড় করিয়েছে। 'অপরাজিত' ২য় খণ্ডতে দেখি পড়াশোনা শেষ করে অপু ৪৫ টাকার কেরানিগিরি করেছে একটি অফিসে। কেরানিগিরির ফাঁকে ফাঁকে বাঁশি বাজানো এবং কল্পনা শক্তি থাকায় একটি উপন্যাস লেখা শুরু করা-সবই এই উপন্যাসে রয়েছে। অপু তার প্রাণের বন্ধু পুলুকে তার সেই অসমাপ্ত উপন্যাস পড়তে দিয়েছে। পুলুর সঙ্গে তার মামার মেয়ের বিয়েতে এসেছে। কিন্তু পাগল ছেলের সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে না হওয়ায় অসহায় অপর্ণাকে বিয়ে করা এবং কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে এসে বসবাস করার মধ্যে রয়েছে অপুর বেঁচে থাকার লড়াই। অপু বাঁচতে চায়, সে মরতে চায় না - বারবার এই কথা সে তার বন্ধু পুলুকে বলে। অপু যে গ্রাম্য পরিবেশকে ভালোবাসে গ্রাম্য প্রকৃতি যে অপুকে টানে সেটা বুঝেই পুলু অপুকে তার মামার বাড়ি খুলনাতে নিয়ে গিয়েছিলো। মামার মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে। অপু ও তার শৈশবের ফেলে আসা গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরের মতো প্রকৃতির শোভা দেখতে পাওয়ার লোভ ছাড়তে পারে নি। কিন্তু গ্রাম দেখা আর হয় না। অপর্ণাদের বাড়িতেই ফুলশয্যা কাটিয়ে কলকাতায় রওনা দেয়। জীবনে তার একটি আক্ষেপ ছিল - তার কোনো নিজস্ব বাড়ি নেই।

কলকাতায় এসে অপর্ণা তার আপন জনের জন্য চোখের জল ফেলেছে। তবে অপুর অর্থকড়ি না থাকায় সে কষ্ট পায়নি। খুব অল্প দিনের মধ্যেই দুজনের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে অপুর কেরানীগিরি আর অপর্ণার গিন্নিপনাতে। কিন্তু সন্তানসম্ভব অপর্ণা বাপের বাড়ি চলে যায়, চিঠি পাওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। কিছুদিন পরে অপর্ণার দাদা এসে জানায় যে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে অপর্ণা মারা গেছে। যে অপু জীবনকে কল্পনা দিয়ে সাজিয়েছিল সেই অপুর হতাশা ধরা পড়ে। ঘরে শুয়ে থেকে থেকে সে শরীর খারাপ করে। অফিস যাওয়া বন্ধ করে দেয়। নিচের তলার প্রতিবেশী কাকিমা তার খাবার দিয়ে যায়, তাই খেয়ে অপু বিছানায় শুয়ে থাকে। অবশেষে বন্ধু পুলুকে চিঠি লিখে, কেরানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। অপূর্ব তার চিঠিতে জানায় যদি সে তার উপন্যাস লেখা শেষ করতে পারে তাহলে তাকে সে পাঠিয়ে দেবে। অপু ঘুরতে ঘুরতে নাগপুরের এক কোলিয়ারিতে গিয়ে কাজের যোগ দেয়। পুলু তার মামার বাড়ি অপুর পুত্রসন্তান কাজলকে দেখে এবং তাদের কাছে অপুর খোঁজ করে। ফুলুর মামা অপুর অবহেলার কথা জানায়। কাজলের কষ্টের কথা শোনায়। কেননা ততদিনে তাঁর স্ত্রী গত হয়েছে। পুলু নাগপুরে গিয়ে অপুকে বুঝিয়ে কাজলের জন্য তাকে খুলনা যেতে অনুরোধ করে। অনেক দ্বিধা নিয়ে অপু শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কাজলকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। অপর্ণা নেই কিন্তু তাদের সন্তানকে মানুষ করার ব্রত নিয়ে অপু কলকাতায় পাড়ি দেয়। সেদিক থেকে ইতিবাচক।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জীবনানন্দের লেখা 'কল্যাণী' উপন্যাসটিকে আলোচনায় আনা যেতে পারে। জীবনানন্দ এই উপন্যাসটির নামকরণ করেন নি। একটি চরিত্রকে ধরে উপন্যাসের নামকরণ করেছেন সম্পাদক। খাতার ওপর লেখা স্থান বরিশাল। A novel-I, a novel-II এবং novel-III-Jibanananda Das, July 1932. একটি মেয়ের বড় হওয়া এবং বাবা মায়ের ভুল সিধান্তের জন্য নিজের জীবন নষ্ট করা। মেয়ে বলে সব কিছুকে মেনে নিতে বাধ্য করা—এনিয়ে কাহিনি।

এখন আমরা দুজন সাহিত্যিকের প্রকৃতি বর্ণনার কিছু অংশ পড়ে দেখতে পারি---"মাঠের ঝোপঝাপ গুলো উলুখর, বনকলমি, সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমীলতা সারা ঝোপগুলার মাথা বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে-ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোট গোয়ালে, নাটাকাঁটা, ও নীল বন-অপরাজিতা ফুল সর্ষের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখীর ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য রাজার মত ভান্ডার বিলাইয়া দান, কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই। বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।"

এবার পড়া যাক অন্য উপন্যাসের প্রকৃতি বর্ণনা—"সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শালিকবাড়ির নদীর পাশে তার দরদালানটা- রায়চৌধুরীদের তেতলা জমিদার বাড়ী; সেই ক্লাইভের আমলের তৈরি আধ-ইংরেজী আধ-মুসলমানী ধরণে একটা মস্ত বড় ধূসর পুরীর মত; চারিদিককার আকাশ মাঠ ধানের ক্ষেত, নদী, নদীর বাঁক, খাড়ি, মোহানা, চরগুলোকে উপভোগ করবার এমন একটা গভীর সহায়তা করছে-দ্বৈতরাজের উচুঁ কাঁধের মত এই প্রগাঢ় বাড়িখানা। তেতলার পশ্চিম দিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে চৌধুরী মশাই দেখছিলেন সব-উত্তর দিকের ন্যাওতার মাঠ-ধু ধু করে অনেক দূরে ভিলুন্দির জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। এই মাঠে কত কি যে ব্যাপার কতবার হয়ে গেল-নিজের চক্ষেও চৌধুরী কত কিছু দেখলেন। তারপর এলো শান্তি-মাঠটা স্কুল-কলেজের ছেলেদের ফুটবল গ্রাউন্ড হল, কখনও বা মীটিং হয় এখানে, কংগ্রেসের ক্যাম্প বসে, ডিস্ট্রিক্ট টিচারদের, মুসলমানদের, মাহিষ্য নমশূদ্রদের কনফারেন্স হয় ; বেদিয়ারা আসে, বৈষ্ণববৈষ্ণবীদের আখড়া হয়ে ওঠে।-----(মাঠটার প্রায় সমস্ত জায়গাই এখন উলুঘাসে ভরে আছে- আর কাশে। কিন্তু ফুটবল খেলা আরম্ভ হবার আগেই মাঠের দক্ষিণ দিকটা বেশ পরিষ্কার করে নেয়া হবে।) বর্ষার মুখে শালিকবাড়ীর নদীটা পেটোয়া হয়ে উঠেছে।"

যদি ব'লে না দেয়া হয় যে প্রকৃতির কোন বর্ণনা কোন্ সাহিত্যিক করেছেন তাহলে পাঠক কখনোই ধরতে পারবেন না যে প্রথমটি হল বিভূতিভূষণের আর পরেরটি জীবনানন্দের। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তখনও বিভূতিভূষণ সাধু ভাষাকে তাঁর উপন্যাসে ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আর জীবনানন্দ ব্যবহার করেছেন চলিত ভাষাকে। ভাষা ব্যবহারের রবীন্দ্রনাথ যেমন ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের পর সাধু ভাষাকে বর্জন করেছিলেন তথাপি অন্য সকল কথাসাহিত্যিক তখনও সাধু ভাষার ব্যবহার করেছেন। কথাটি এমন নয় যে কেবলমাত্র ভাষা ব্যবহারই আধুনিকতাকে প্রমাণ করে। কিন্তু একথা সত্য যে ভবিষ্যতে যে ভাষা মানুষের একমাত্র ব্যবহার এবং প্রয়োগের ভাষা হয়ে দাঁড়াবে সেই ভাষাকে আয়ত্ত করে সাহিত্য রচনা করাও কম সাহসের কথা নয়।

তবে বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' দ্বিতীয় খন্ডের সঙ্গে জীবনানন্দের ছোটগল্প 'মা হবার কোন সাধ' গল্পের নায়কের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। 'অপরাজিত'তে অপুর উৎসাহ বিষণ্ণতা অপর্ণার শোকে নিজের পুত্র সন্তান কাজলকে না দেখা, তাকে গ্রহণ না করার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। একটা রাগ অভিমানের আকারে ধরা পড়েছে। তার কেবলই মনে হয়েছে যে, কাজল

বেঁচে আছে বলেই অপর্ণা নেই। এটা এক ধরনের হীনমানসিকতা। জীবনানন্দের গল্পের নায়ক চরিত্রের মধ্যে এইরকম হীনমন্যতা, বিষন্নতা সব সময় কাজ করে। তাই 'মা হবার কোন সাধ' গল্পের নায়ক কলকাতায় থেকে যায়। অথচ বরিশালে তার স্ত্রী শেফালী একটি মেয়েকে জন্ম দিয়ে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে এবং সে মারা গেছে। ঠিক অপুর মতোই নায়ক সন্তানের কাছে ফিরে যায়নি। কেননা সে দেখেছে তার স্ত্রীর প্রতি বাড়ির গুরুজনদের নিষ্ঠুর ব্যবহার। তখন সে তার প্রতিবাদ করতে পারে নি কারণ প্রতিবাদ করার মতো রোজগার তার ছিল না। তাই একরকম লুকিয়ে সে কলকাতায় থাকতো। মেয়ে জন্মানোর প্রায় দুমাস বাদে নায়ক বরিশালে ফিরেছে। অবশ্য মেয়েকে সে কোলে নিয়ে বসেছে এবং প্রতিজ্ঞা করেছে যে তার মেয়েটিকে শেফালির মত কষ্ট পেতে দেবে না। হয়তো জীবনে সে কষ্ট পেতে পারে, তবুও প্রথম থেকেই সে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি।

লক্ষণীয় বিভূতিভূষণ কিন্তু অপুর ছেলে কাজলের প্রসঙ্গ এনেছেন। কিন্তু জীবনানন্দ একটি মেয়ের জন্মের কথা বলেছেন। আজও যখন কোনো মা কন্যা সন্তানের জন্ম দিলে সকলেই তাকে অপয়া বলে ধিক্কার জানায়, জীবনানন্দ কিন্তু ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কোনো কন্যা সন্তানের জন্মকে সেই ভাবে ধিক্কারের চোখে দেখেননি। এই যে কন্যা সন্তানের জন্ম সম্পর্কে তাঁর এই ভাবনা- তিনি কি একবিংশ শতকে নারীর এই উত্থানকে অনুভব করতে পেরেছিলেন? নইলে বেশিরভাগ গল্প-উপন্যাসে দেখি সন্তান হলেই তিনি কোনো খুকি বা কোনো খুকির নাম টুকুন সেই প্রসঙ্গই বারবার তুলে ধরেছেন। এই গল্পের নায়কের সন্তানের প্রতি বা কন্যা সন্তানের প্রতি যে ইতিবাচক চেষ্টা তাই গল্পটিকে বিশেষত্ব দিয়েছে। শুধুমাত্র জীবনের দারিদ্রতাকে অতিক্রম করে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা তা হয়তো এই গল্পে কম আছে কিন্তু তবুও গল্পের নায়ক চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে নবজাতককে সে পুত্রই হক বা কন্যা তাকে নিয়ে নতুন ভাবে জীবন গঠন করার প্রচেষ্টা। সেক্ষেত্রে জীবনানন্দ সমসাময়িক অন্য উপন্যাসিকদের থেকে যে পিছিয়ে ছিলেন তা কিন্তু নয়। বরং অনেক এগিয়ে ছিলেন।

জীবনানন্দ প্রায় প্রথম থেকেই দুই একটি গল্প বাদ দিয়ে চলিত ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। অনেকটা কাব্য ভাষার নতুনত্বের মতোই। তিনি কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর 'কয়েকটি লাইন' কবিতায় বলেছিলেন- 'কেউ যাহা জানে নাই- কোন এক বানী-/আমি বহে আনি;/একদিন শুনেছ যে সুর-/ ফুরায়েছে-পুরানো তা---" কথাসাহিত্যেও তিনি নতুন ভাষা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। প্রচুর লিখেছেন কিন্তু একটি গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ না করে তিনি অসীম ধৈর্য ও পরিশ্রম করে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে গেছেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ জীবনানন্দের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য বছর কারণ তিনি এই বছরেই 'ক্যাম্পে' কবিতার সমালোচনার জবাবে লিখেছিলেন - "কিন্তু তবুও 'ক্যাম্পে' অশ্লীল নয়। যদি কোনো স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের-মানুষের-কিট-ফড়িংয়ের সবার জীবনেরই নিঃসাহায়তার সুর। সৃষ্টির হাতে ঢের নিঃসহায় – 'ক্যাম্পে' কবিতাটির ইঙ্গিত এই; এইমাত্র।" তিনি বারবার বোঝাতে চেয়েছিলেন সৃষ্টি যেন এক শিকারী এবং বারবার সৃষ্টির নিজস্ব যুক্তির কাছে তিনি যেন পরাজিত হয়েছেন।

সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মতো জীবনানন্দও দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন, অনুভব করেছেন। অর্থনৈতিক মন্দা সমাজকে কিভাবে ধীরে-ধীরে কুক্ষিগত করে নেয় তিনি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করেছেন। সময়ের যে ভায়োলেন্স তা তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবে তিনি কখনোই 'সিস্টেমের দাস' হয়ে যাননি। তিনি এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা কখনোই ব্যবসায়ী নয়, শিক্ষা এক ধরনের বাসনা- যাকে তিনি বলেছেন 'কারুবাসনা'। তিনি অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ করেছেন যে তৃতীয় শ্রেণীরসাহিত্য পাঠক হাতের কাছে টেনে নেয়, যে সাহিত্য শেষ পর্যন্ত শিল্প হিসাবে গণ্য হয় না। ১৯৩২-৩৩ এই সময়টা শুনলেই অবাক হতে হয়। কারণ শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তখন বেস্ট সেলার এর ধরন এনে দিয়েছে। পাশাপাশি কল্লোল ও কালিকলমের লেখকগণ বাংলা উপন্যাসে এক উদ্ভট ইউরোপিয়ান স্টাইল ভাষার আধুনিকতায় ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আরেকবার গল্প উপন্যাসে নতুন করে হাত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও কল্লোল গোষ্ঠীর বাইরে জগদীশ গুপ্ত নিজের স্বতন্ত্রে রচনা করে চলেছেন তাঁর গল্প উপন্যাস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর তখনও তেমনভাবে প্রকাশিত নন। উপন্যাস চর্চার ক্ষেত্রে জীবনানন্দের এই সময়কার লেখা উপন্যাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই উপন্যাসের কাহিনি সমকালীন উপন্যাসের প্রচলিত কাহিনি নয়। এই উপন্যাসের ভাষা প্রচলিত ভাষা নয় কারণ তাঁর লেখার মধ্যে ড্যাশ এর প্রয়োগ বেশি তারপরই সেমিকোলন এবং কোলন। তাঁর লেখা উপন্যাস একেবারেই নিজস্বতায় ভাস্বর। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণের সঙ্গে আরেকটু মিলের কথা না বললেই নয় তা হল ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ৬ সেপ্টেম্বর বিভূতিভূষণ বনগাঁ কলেজের বাংলার অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। তাঁর জীবনে যখন এসেছে সুখ এবং শান্তি, ঠিক তখনই মাত্র দু মাস পরে ১ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ঠিক সেই রকমই ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক রূপে যুক্ত হন। জীবনে শুরু হয়েছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ। তিনি হয়তো স্থির হয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন তাঁর এতদিনকার রচনা প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু মাত্র এক বছর পরেই ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ২২ অক্টোবর কলকাতায় ট্রাম এক্সিডেন্টে তিনি মারা যান।

বিভূতিভূষণের সঙ্গে জীবনানন্দের সামান্য অমিল লক্ষণীয়। বিভূতিভূষণ তাঁর এই সময়ের উপন্যাসে কোনো দাম্পত্য কলহ বা প্রেম-অপ্রমের চিত্রকল্প তৈরি করেননি অর্থাৎ বলা যেতে পারে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকলেও তিনি তাকে গল্প উপন্যাসে প্রকাশ করেননি। কিন্তু জীবনানন্দ তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই গল্পের বিষয় করেছেন। তিনি নিজেকে কেবল মাইনর লেখক ভেবেই ক্ষান্ত হননি তাঁর লেখায় এসেছে প্রান্তিক মানুষ-কখনো ভিখারি, চায়ের দোকানের মালিক, কুষ্ঠ রোগী, মেথর এমনকি এক পানওয়ালীও উপন্যাসের নায়িকা হবার স্পর্ধা দেখিয়েছে। জীবনের সাংসারিক দারিদ্র্য কিভাবে একটি মানুষকে ভেতরে ভেতরে নিস্তেজ, ক্লান্ত, বিষন্ন, অকর্মণ্য ক'রে তোলে তাকেই যেন জীবনানন্দ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস পাঠ করে বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা চিন্তা করেছিলেন। পরবর্তীকালে 'অপরাজিত' এবং 'অপরাজিত' দ্বিতীয় খণ্ডকে 'অপুর সংসার' নাম দিয়ে পুনরায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে 'অস্কার' পুরস্কারে ভূষিত হন সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী'র সুবাদে। আমরা জানি জীবনানন্দের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের খুব বেশি যোগাযোগ না থাকলেও তাঁর 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়। জীবনানন্দের কবি মানসিকতাকে সত্যজিৎ রায় অনুভব করেছিলেন এবং তার জন্যই ঘনলতাপাতার মধ্যে বেরিয়ে থাকা চিরন্তন বাঙালি নারীর কোমল সেনসিটিভ একখানা মুখ সরু সরু লাইনের প্যাটার্ন দিয়ে ভরাট করা এই ভাবেই ছিল বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ। কিন্তু পাঠকদের জানা উচিত ঐ প্রচ্ছদ কবির পছন্দ হয়নি। ৬.১০.৫২ তে সুরজিৎ দাসগুপ্তকে লেখা চিঠিতে লিখেছেন- "আমার 'বনলতা সেন' দেখে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছি। এমন খারাপ প্রচ্ছদপট আমি আমার জীবনে দেখিনি। Signet Press এর হাতেও বইয়ের এই দশা।" তাহলে কি কবির মনে অন্য কোনো মুখ ছিল। সে প্রশ্নও আজ উঠে আসে। যদি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দেই জীবনানন্দ তাঁর রচিত গল্প, উপন্যাস গুলো প্রকাশ করতেন তাহলে অবশ্যই অন্যান্য পাঠকের মতো সত্যজিৎ রায় পাঠ করতেন এবং তিনিও হয়তো বা 'কারুবাসনা' উপন্যাস নিয়ে তৈরি করতেন শিল্পী মনের কারুবাসনা। কিন্তু কোনো উপন্যাস বা গল্প প্রকাশিত না হওয়ায় তা সকলের চোখের আড়ালেই রয়ে গেল। আর একটি কথা না বলে পারছি না সেই কথাটি হল- ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে বিভূতিভূষণ লিখেছেন ১টি উপন্যাস, ছোটগল্পগ্রন্থ ১টি, যা প্রকাশিত হয়েছে লেখার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু জীবনানন্দ কোনো কিছু লিখেই প্রকাশ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। নইলে ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৭টি উপন্যাস, ৫৭টি ছোটগল্প, ডায়েরির পাতা ১০০১ টি, কিছু চিঠিপত্র অর্থাৎ প্যাণ্ডুলিপিতে মানুষটির ট্রাঙ্ক ভর্তি কিন্তু সেই পর্বে তাঁর প্রকাশিত রচনা বলতে ১টি মাত্র কবিতা। যে কবিতার জন্য তাঁকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। কবিতাটি হল 'কাম্পে' সকলেই জানেন। যদি ঐ সময়ে কিছু গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হ'ত তাহলে বাংলা গল্প এবং উপন্যাস আরও অনেক আধুনিক হত,-এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না।

সহায়ক গ্রন্থসূচী

1. দেবীপ্রসাদ বন্ধ্যোপাধ্যায়-জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত।
2. বিভাব- জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা।
3. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-'পথের পাঁচালী'।
4. গৌতম মিত্র-পান্ডুলিপি থেকে ডায়েরি জীবনানন্দের খোঁজে-১,২
5. জীবনানন্দ সমগ্র-(১-১২)-সম্পাদনা-দেবেশ রায়।
6. দেশ-জীবনানন্দ-১